উর্বী এসেছে নিশ্চিত না হয়েই যে আমি ওর সঙ্গে দেখা করব। এবার এসে হোটেলে যায়নি। রিজেন্ট পার্কে বউদির দোতলার নতুন ফ্ল্যাটে উঠেছে। কলকাতায় পৌঁছেই উর্বী আমাকে ফোন করেছে অনুরোধ করতে আমি ওর সঙ্গে যেন একবারের জন্য হলেও দেখা করি। বুঝতে পারছিলাম খুব কাতরাচ্ছে ও। বুঝে খুব ভালো লাগছিল আমার। আমি শক্ত গলায় পরদিন সন্ধে সাতটায় সময় দিলাম। বললাম, ব্যস একবারই। আর নয়।

এতদিন ওর সঙ্গে আমি কথা বলেছি। এতদিন মানে অবশ্য অনেকদিন নয়। মাত্র দু'মাস। মাত্র দু'মাসে অনেক কথা বলেছি। ওকে নিয়ে অনেক কিছু জানার সুযোগ আমায় সে দিয়েছে। কিন্তু হাজব্যান্ডকে রেখেছে অন্ধকারে। উর্বী তার টাকার অতিরিক্ত মোহ ছাড়া আর কোন দোষ তুলে ধরেনি। বরং বাকি সবকিছু ভালোই বলেছে। এতটাই ভালো যে ওর তাকে ভগবান মনে হয়। তবু আমি জেনে গেছি উর্বী সুখী নয়। তাই সে আমার মতো বাউরাকে হারাতে চায় না। আমার মনে হয়েছে এত টাকা থেকেও, এত স্বাধীনতা ভোগ করেও কোথাও একটা ভীষণভাবে পরাধীন থেকে গেছে সে। নিজের এত বড় পরিচিতি থেকেও সে হাজব্যান্ডের পরিচয়ে চলছে। হাজব্যান্ড বন্ধু হয়েও কোনও এক অসম্ভব শাসনে বেঁধে রেখেছে তাকে। আমার মনে হয় উর্বী বেরিয়ে আসতে চায় এসব বাঁধন থেকে। খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে লম্বা শ্বাস নিতে চায় আমার হাত ধরে। ও একটা মনের মানুষ চায়, একটা বন্ধু চায়। হেলে শাপের মতো—যে ওকে কাটবে না, কিংবা কাটলেও বিষ দেবে না। আমাকে পছন্দ করেছিল সে। হেলে সাপ আমি। সেই হেলে সাপই অনেক বড় ছোঁবল মেরেছে। দু'দিন আগে। আশাতীতভাবে বিষ ঢেলে দিয়েছি ওর শরীরে। ছটফট করছে ও। ঝেড়ে ফেলতে চাইছে সেই বিষ। বাঁচতে চাইছে আবার নতুন করে সেই হেলে সাপেরই সাথে।

*****

রিজেন্ট পার্কে বউদির বাড়ির নিচে পৌঁছে আমি উর্বীকে ফোন করলাম। তিন মিনিট অপেক্ষা করিয়ে হাফ তলার খোলা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল সে। চেনা মানুষটিকে অচেনা পোশাকে দেখলাম আমি। মেখলা পরেছে। গরদের রঙের মেখলা। তাতে সুতোর কাজ করা চওড়া লাল-সবুজ বর্ডার। লাল বড় টিপ উর্বীর কপালে। ঠোঁটে লাল লিপস্টিক। সারা গলা জুড়ে নেকলেস। বাঁ হাত ভর্তি সোনার বালা ও চুড়ি। ডান হাতে সোনার বালার সঙ্গে সোনার রঙের ঘড়ি। আর্থিক প্রাচুর্যের ছাপ শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। আমার মনে হল কনে আসছে ছাঁদনাতলায় বসবে বলে। পরমাসুন্দরী কনে। কি এক ঘোরে ডুবে গিয়ে দেখতে থাকলাম ওকে। উর্বী ধীরে ধীরে নেমে পাশে দাঁড়াতেই হুঁশ ফিরে এল আমার। আমি ছিটকে গেলাম। ভাবলাম না, নরম হলে চলবে না। ওর জীবনে আমার বিশেষ হয়ে ওঠা এখনও অনেক বাকি। ওর মনে আমার স্থান আরও মজবুত হওয়া

প্রয়োজন। রাস্তা পেরিয়ে ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাক্সির কাছে গেলাম। উর্বীও এল আমার পেছন পেছন। জিজ্ঞেস করলাম ওকে, "কোথায় যেতে চাও?"

"তোমার যেখানে ইচ্ছে।"

আমার ইচ্ছে হল এলোমেলো ঘোরার। ট্যাক্সি নিয়েই। কোথাও না নেমে।

উর্বী বসল আমার পাশে। একটু দূরে পেছনে হেলান না দিয়ে। মাথাটা আমার বিপরীতে একটুখানি ঘুরিয়ে। অভিমানে হবে।

এবার সে আছে বউদিদের সঙ্গে। বউদিরা ওকে খুব ভালোবাসেন। আমি জেনেছি। বুঝেছি। নাহলে কোন প্ল্যান পরিকল্পনা ছাড়া তাদের বাড়িতে এসে এভাবে ওঠা যায় না। গতকাল রাতে যে নম্বর থেকে ও মেসেজ করেছিল সেটা ওর নম্বর ছিল না। লোকাল সিম। বউদিরই হবে। মেসেজের নিচে নাম দেখে বুঝেছিলাম ও। নিশ্চয় ওর সিমে কোন প্রবলেম হয়ে থাকবে। পরদিনই, মানে আজ যে উর্বী সন্ধের পর এত সেজেগুজে নিচে নেমে এসেছে আমারই কাছে তা নিশ্চয় বউদিরা জানেন। অথবা অনুমান করেছেন। জেনে বা অনুমান করে যেটাই হোক না কেন নিশ্চয় কোন অসন্তোষ নেননি। নিশ্চয় নয়। কেননা উর্বী বউদির ফোন পেল এবং আমি ওকে বলতে শুনলাম, "চিলি চিকেন? চলবে।" হয়ত রাতের খাবারের মেনু তৈরি হচ্ছে।

নিজের দুর্বলতা পাছে প্রকাশ পেয়ে যায় এই ভয়ে আমি বউদির ভালবাসায় সম্পৃক্ত হয়ে বসে থাকা উর্বীকে আড়চোখে দেখতে থাকলাম। ওর সৌন্দর্য উপভোগ করতে থাকলাম। নেশা আবার বেহুঁশ করল আমায়। বেহুঁশ অবস্থায় দেখলাম বাসর ঘর। সেখানে নতুন বউ। উর্বী। মাথা নিচু করে বসে আছে। ও আমায় অনেক কথা বলতে চাইছে। নিঃশব্দে। যা আমাকে বুঝে নিতে হবে। একটু চাইলেই পারি। কিন্তু আমি তা চাইছি না। ইচ্ছেই রাখছি না ওকে বোঝার। আমি চাইছি অন্য কিছু। উর্বীর হাত ধরে ধীর পদক্ষেপে আমি ফুলশয্যার ঘরে প্রবেশ করলাম। বসিয়ে দিলাম ওকে বিছানার এক প্রান্তে। তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে অনেকক্ষণ। সেই অনেকক্ষণ ও চোখদুটিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে সহ্য করল আমায়। আমি ধীরে ধীরে ওর ঘোমটাটা খুলে ফেললাম। মাথার টায়রা খুললাম। নাকের নোলক, কানের ঝুমকা, গলার হার, হাতের বালা সব। একের পর এক। বাদ গেল না একটি আভরণও। আভরণ যত খুলছিলাম ততই সুন্দর হয়ে উঠছিল সে আমার কাছে। নাকের নথ, কানের দুল, গলার মালা, হাতের চুড়ি খোলা হলে আমি হাত দিলাম ওর চুলে। উঁচু করে বাঁধা খোঁপাটা এক টানে খুলে দিলাম। দেখলাম মাথার চুল কালো সাপের মতো এঁকেবেঁকে নিচে নেমে এল। ঢেকে দিল ওর শাড়ির আঁচল। আমার ভালো লাগল না। শাড়ির আঁচলের পিন খুলব বলে হাত বাড়ালাম আমি। এবার উর্বীর কাছে প্রথমবার বাঁধা পেল আমার হাত। হাতকে বাধা দিয়ে অসহায় চোখে তাকালো সে আমার দিকে।

ট্যাক্সি ড্রাইভার বলল, "মিন্টো পার্ক এসে গেছে। এখন কোথায় যাবেন?"

"উঁ! এসে গেছে মিন্টো পার্ক! ঠিক আছে, গড়িয়াহাটের দিকে চলো।"

উর্বী চুপচাপ একইভাবে বসে আছে পাশে। কষ্ট হল ওর কোমল নরম মনকে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছি বলে। আবার শিরদাঁড়ায় সেই একই ব্যথা অনুভব করলাম। সেই রাতের মতো। একইভাবে উপরে বুকের দিকে চড়তে লাগল ব্যথা। মোচড় খেয়ে।

ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে আমার খুব গালি দিতে ইচ্ছে করল ওর হাজব্যান্ডকে। মনে হল উর্বীর পা ধরে বলি, 'আমায় ক্ষমা করে দাও উর্বী'। অনেক ভালোবাসি তোমাকে। অনেক।

*****

আমার প্রথম প্রেম ছিল অর্পিতা। বলি প্রেম, কিন্তু আসলে তা প্রেম নয়। প্রেমের নামে ছলনা। অর্পিতা আমাকে ধোঁকা দিয়েছে। খুব খারাপভাবে। অবশ্য আমি তার জন্য যে একেবারেই দায়ী ছিলাম না তা নয়। আমি ওকে প্রেমে নিরাপত্তা দিতে পারিনি। বাড়ির কারও সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারিনি। বলতে পারিনি চিন্তার কিছু নেই। খুব তাড়াতাড়িই তোমাকে বিয়ে করে ঘরে তুলছি। তবুও আমি নিজের দোষ না দেখে অর্পিতার দোষ দেখি। অর্পিতার তাড়া ছিল। না ও কলেজ স্টুডেন্ট, না চাকরিজীবি, না ব্যবসায়ী। অর্পিতা একটি পরজীবী। এক স্বামীর কাঁধ থেকে নেমে অন্য একজনের কাঁধ খুঁজছিল। আরে বাবা, অন্যের কাঁধ ছাড়া যদি চলবেই না, তাহলে তাকেও তো সময় দিতে হবে কাঁধটা মজবুত করার জন্য!

বুম্বার মতো প্রেমে ঝাড় খেয়ে আমি গোঁ ধরে বসে থাকিনি আর প্রেম করব না বলে। তাই উর্বীকে পেয়েছি।

উর্বীর কারও কাঁধের প্রয়োজন নেই। ওর একজন সহযাত্রীর দরকার। সহযাত্রী সে টাকা দিয়েও পেতে পারে। তার এমন একজন সহযাত্রী দরকার যে ওকে মন দিয়ে ভালোবাসবে। আমারও এমন একজনকে প্রয়োজন যে আমার দারিদ্র বুঝে আমার মন পেলেই খুশি হবে। সেই মন আমি যে ওকে অনেক আগে থেকেই দিয়ে রেখেছি তা উর্বী জানে না। কারণ ওকে আমি জানতে দিইনি। আগে বুঝিনি ও গ্রহণ করবে কিনা এই মন, তাই জানাইনি। আজ যখন সেই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা হয়ে গেছে, তখনও জানাইনি। উর্বী আমার জীবনে অন্য কোন মেয়েকে মেনে নিতে পারে না। তার মানে খুব স্পষ্ট। খুব বড় এক ফয়সালা হয়ে যেত পারত আজ। কিন্তু হল না। আমি ওকে কিচ্ছু বললাম না। রিজেন্ট পার্ক এল। নেমে গেল সে। একবারও পেছন ফিরে আমায় দেখল না। আমি দেখলাম ওকে যতক্ষণ পর্যন্ত না ও দোতলার সিঁড়ি বেয়ে অদৃশ্য হল।

তখন রাত বারোটা হবে। আমি উর্বীকে মেসেজ করলাম, "খুব সুন্দর লাগছিল আজ তোমাকে দেখতে।" আশা ছিল কিছু উত্তর পাব ওর। কিন্তু পেলাম না। উর্বী আজ আমার সামনে ভালো লাগার কমপ্লিমেন্ট নিতে সেজে আসেনি, সে সেজেছে এটাই বোঝাতে 'তোমার দিদির বান্ধবীর দিদির মেয়ে আমার চারসীমানায় ভিড়তে পারবে না'। রূপের আগুনে আমাকে ঝলসে দিয়েছে সে। দিয়ে আবার রাতে সেই ঝলসানো শরীরে সূর্য থেকে ঠাণ্ডা আলো নিয়ে এক মোটা প্রলেপ লাগিয়ে দিয়েছে। মলমের মতো। আমি শান্ত হয়ে গেছি। আমার শরীরের সেই ঠাণ্ডা প্রলেপের বাইরে অনতিক্রম্য দীপ্তি নিয়ে বিরাজ করছে উর্বী। আর তার ওপারে রয়েছে দিদির কলীগের দিদির মেয়ে, শর্বরী, তামসী, রজনী, রাত্রি সব। আমি তাদের দেখতেই পাচ্ছি না।

ধাঁধানো চোখ নিয়ে ঠাণ্ডা আলোর মোটা আস্তরণের নিচে চাপা পড়ে আমি উর্বীর থেকে উষ্ণতা টেনে নিজেকে গরম করতে চেয়েছিলাম। বলেছিলাম, "আজ অপূর্ব সুন্দরী লাগছিলে তুমি।" ভেবেছিলাম উর্বী বলবে, 'কি যে বলো না তুমি!" *আহ্।* ভেবেছিলাম আমি বলব, "কিছু বলবে বলেছিলে।"

আর ও বলবে, "কিছু না।"

"বলো প্লীজ।"

"কিছু নেই বলার।"

"না, আছে।"

"নেই।"

"আছে।"

"নেই।"

"আছে।"

"চুপ!"

আমার গায়ে শিহরণ উঠবে। আমি উর্বীকে খুব কাছে অনুভব করব। খুব কাছে। খুউব। কোন দূরত্ব থাকবে না আমাদের মধ্যে। কিন্তু সে কিচ্ছু না বলে ঠাণ্ডায় ফেলে রাখল আমাকে। ঠাণ্ডা থেকে তাপ বিকিরণ করে আমি আরও ঠাণ্ডা হলাম। একেবারে বরফ। সকালে উর্বীর 'গুড মর্নিং' মেসেজটা খেয়ে হজম করে ফেললাম। বিকেলের গুড আফটারনুন। রাতের গড নাইট। একটিও উত্তর দিলাম না। একবারও জিজ্ঞেস করলাম না কবে ফিরছে। জানতে চাইলাম না ভাইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা হল কিনা।

*****

‘এস বি আই’-এ ইন্টারেস্টটা ভরা বন্ধ করেছি বলে সাড়ে পাঁচ কি ছয় হাজার টাকা হাতে থাকছে। কিন্তু ওই কটি টাকা বাঁচানোর বিনিময়ে ধকল সামলাতে হচ্ছে কম না। মাঝে মাঝেই গুঁরগাও থেকে ফোন পাচ্ছি। একদিন তো ব্যাংকের লোক ঘরে এসে হাঙ্গামা করে গেল। আমি ‘ঠিক আছে, দেখছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কিছু একটা করছি—মানে সেটলমেন্টে আসার চেষ্টা করছি’ বলে শান্ত করে ফেরত পাঠালাম। নাহলে লোক জানাজানি হয়ে যেত আর পাড়ার মিটিং-এ আমার হাঁড়ি ফাটত। ফেরত গিয়ে পরের সপ্তাহে একটি লোক ফোন করল কলকাতা থেকেই, “দাদা কবে করছেন সেটলমেন্ট?”

আমি বললাম, “এই তো। সামনের মাসে পেমেন্টটা পেয়েই। কিন্তু টাকাটা একটু কম করতে হবে আপনাদের।”

“শুনুন, আপনার এক লাখ ষাটের উপর ডিউ হয়ে গেছে। কম করেই তো আমরা বিরানব্বই হাজার টাকা বলেছি। কত দিতে চাইছেন আপনি?”

“সাড়ে পাঁচ।”

“ইয়ার্কি মারছেন? সাড়ে পাঁচ হাজার হল আপনার প্রতি মাসের ইন্টারেস্ট। ওটা ওয়ান টাইম লাম্প সাম হল নাকি!”

“দেখুন আমি এত দিতে পারব না। পাঁচ সাড়ে পাঁচ করে চারটে ইনস্টলমেন্ট কুড়ি বাইশ হাজার দেব।”

“হবে না। ইন্টারেস্টই আপনার চব্বিশ হাজার বাকি হয়ে যাচ্ছে। তিন মাস থেকে পে করেননি। এমাস দিয়ে চার মাস হবে। বোঝার চেষ্টা করুন।”

আমি ওদের যুক্তি বুঝি না। নিজের প্রপোজালে গোঁ ধরে বসে থাকি।

তারপর, মাত্র কয়েকদিন বাদে আমার মোবাইলের ট্রু কলারে দেখলাম দিল্লি সি বি আই থেকে ফোন, “আমি কি তামস ঘোষের সঙ্গে কথা বলছি?”

“ইয়েস।”

“‘এস বি আই’-এর ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত ব্যাপারে ফোন করেছিলাম...”

“বলুন।”

“...দেখুন স্টেট ব্যাংক থেকে আপনার নামে একটা ওয়ারেন্ট ইস্যু হবে। তার আগে আমরা আপনার কাছ থেকে ব্যাপারটা পুরো জানতে চাইছি।”

আমি বললাম, “হ্যাঁ...এরকম বাকি আছে...প্রতি মাসে আর ইন্টারেস্ট ভরতে পারছি না ...ওরা বাড়িতে এসেছিল...আমি ওদেরকে কিছু টাকা নিয়ে সেটলমেন্ট করার জন্যে বলেছিলাম, কিন্তু ওরা করেনি।”

“মিথ্যে কথা। আপনি সেটলমেন্টের কথা বলেন নি। আমাদের কাছে রেকর্ড আছে।”

“হতেই পারে না।”

“কত দিতে চেয়েছেন আপনি?”

“ইনস্টলমেন্ট-এ কুড়ি বাইশ হাজার।”

“ক্রেডিট কার্ডে ইনস্টলমেন্ট হয় না। আর শুনুন কুড়ি বাইশে চলবে না। আপনাকে বিরানব্বই হাজারই দিতে হবে একসঙ্গে। নাহলে আপনার জেলও হয়ে যেতে পারে।”

“যা হবে হবে। আমি এত দিতেই পারব না।”

“ঠিক আছে বাহাত্তর হাজার দিন সোমবারের মধ্যে।”

“পারব না।”

“দিতে তো আপনাকে হবেই।”

ভাবলাম বড্ড ফ্যাসাদে পড়লাম তো! তাৎক্ষণিক ঝামেলা থেকে মুক্তি পেতে বলতে হল, “ঠিক আছে চেষ্টা করছি।”

সেই চেষ্টা আমি এখনও করে চলেছি। দু’তিন দিন পর থেকেই ওরা আবার আমাকে বারবার ফোন করা শুরু করেছে। আমি এড়িয়ে চলেছি ক্রমাগত।

একটা ভালো চাকরির প্রয়োজন। নাহলে আমার অবস্থা নিচে নামতে নামতে গুড্ডুর চাইতেও খারাপ হবে। গুড্ডুও একটা বেচারি। আমাদের বন্ধুদের গ্রুপেই আছে ও। অটো চালিয়ে যা ইনকাম হয় তাতে বাড়িতে বউ-বাচ্চা খাইয়ে নিজের ভাগে টান পড়ে। আশপাশের যত সব মন্দির আছে সেখানে পুজো ও লোক খাওয়ানো হলে গুড্ডু ধরনা লাগায়, কাগজের কিংবা পাতার থালা ভরে খাবার বয়ে নিয়ে আসে ঘরে। আর তার লোভকে হাতিয়ার করে গ্রুপের বাকি সদস্যরা তাকে মিথ্যে খবর দিয়ে হয়রানও কম করে না। আমার বাড়িতে মামার উপার্জন থাকায় মামা যতদিন বেঁচে আছেন খাওয়া আমার জুটবে কিন্তু মাঝে মাঝে এগরোল তো দূরের কথা বছরে একটা জাঙ্গিয়া কেনারও টাকা থাকবে না। তখন দেখা যাবে আমি উর্বীর সঙ্গে জাঙ্গিয়া ছাড়া প্যান্ট পরে ঘুরছি অথবা ঘোরার সময় ভদ্রতা রক্ষার খাতিরে প্যান্টের নিচে সস্তা মার্কিন কাপড়ের লেংটি পরে নিয়েছি।